প্রাণের মেলা বৈশাখী

কাইউম পারভেজ

পহেলা বৈশাখ বাংলা ক্যালেন্ডারে, বাঙালি সংস্কৃতিতে এবং বাঙালি জাসিত্বাতে এক গুরুত্বপূর্ণ আনন্দ মুখর দিন। শুধু যে বাঙালিরাই পহেলা বৈশাখের উৎসব নিয়ে মেতে থাকে তা কিন্তু নয়। এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে বৈশাখী উৎসব হয়ে থাকে। তবে বিশ্বের সব জাতির সব ভাষাভাষির মধ্যে নববর্ষের উৎসবের রেওয়াজ রয়েছে।

বাংলা অঞ্চলের নববর্ষের সঙ্গে দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের নববর্ষ এবং উৎসবের মিল-অমিল দুটোই বিদ্যমান। তবে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাসের যোগসূত্র রয়েছে। একসময় যে বৃহৎ 'বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা' রাজ্যটি ছিল, তার তিনটি কেন্দ্র - বাংলাদেশ, বিহার ও উড়িষ্যায় নববর্ষ এখনো উদযাপিত হয় একই দিনে, অর্থাৎ ১৪ এপ্রিলে। ফলে এ অঞ্চলে সৃষ্ট একটি সাংস্কৃতিক মিলন এবং বন্ধন এখনো উপস্থিত।

বাংলায় মুঘলদের আমলে হিজরী দিনপঞ্জি দিয়ে কৃষি খাজনা আদায় করা হতো। যেহেতু হিজরী দিনপঞ্জি ছিলো চাঁদের হিসেবে তাই ফসল ঘরে তোলার সাথে খাজনা দেয়ার হিসেব মেলানো খুব কষ্টকর ছিলো। অর্থাৎ যখন খাজনা দেবার সময় হতো তখনো ফসল মাঠে। কৃষকরা খাজনা দিতে পারতো না - পরিনামে চরমভাবে নির্যাতিত হতে হতো। ওদিকে রাজ কোষাগারে খাজনা অনাদায়ে অর্থের ঘাটতি দেখা দিতো। ভূস্বামী জমিদার মহাজনেরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতো। এ সকল সমস্যাকে আমলে এনে সম্রাট আকবর বললেন দিনপঞ্জির ধারা বদলাতে হবে যাতে কৃষককে আর নির্যাতিত হতে না হয় ওদিকে রাজ কোষাগারেও একটা স্বচ্ছলতা আসে। সে সময়ে ফতেহউল্লাহ সিরাজী নামে খ্যাতনামা একজন জ্যোতির্বেত্তা ছিলেন। তো সম্রাট আকবর তাঁকে দায়িত্ব দিলেন নতুন দিনপঞ্জি তৈরীর। চন্দ্রের হিজরী আর সৌরের গানিতিক হিসেবনিকেশ করে তিনি তৈরী করলেন "ফসলী সন"। এই ফসলী সন চালু হলো ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ মার্চ থেকে কিন্তু এটাকে হিসেবে ধরা হয় সম্রাট আকবরের সিংহাসনের আরোহনের সময় থেকে অর্থাৎ ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। পর্য্যায়ক্রমে এই 'ফসলী সন' পরিচিতি পেলো বঙ্গাব্দ বা বাংলা বর্ষ হিসেবে।

তাই পহেলা বৈশাখের উৎসবও শুরু হয়েছিলো সম্রাট আকবরের সময় থেকেই। তখন নিয়ম হয়েছিলো চৈত্রের শেষ দিনের মধ্যে ফসল ঘরে তুলে খাজনা পরিশোধ করতে হবে। পরদিন নতুন বছরের নতুন দিনে ভূস্বামী জমিদার মহাজনেরা প্রজাদের মিষ্টিমুখ করাতেন। প্রজারাও খাজনা দিতে পেরে স্বস্তি পেতেন। সবার মধ্যে একটা আনন্দের জোয়ার। সেটাই সবাই মিলে উদযাপন করতে মেলা বসিয়ে একটা হৈ চৈ হুল্লোড়। বৈশাখের প্রথম দিন থেকেই তার শুরু এবং তা কয়েকদিন ধরেই। তবে পহেলা বৈশাখের যে প্রধান পর্ব তা হলো নতুন "হালখাতা" বা হিসেবের খাতা খোলা। পুরোনো খাতার হিসেবনিকেশ চুকিয়ে নতুন খাতা খোলা। ভুস্বামী আর প্রজাদের মধ্যে একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা। তখন কৃষকের ঘরেও ফসল তাই মেলা হৈ চৈ-তে, হাসি আনন্দে তো কোন বাধা নেই।

আমাদের পহেলা বৈশাখের মতই নানা দেশে নানা আঙ্গিকে নববর্ষ পালনের প্রচলন আছে। অঞ্চল, ভাষা ধর্ম ভেদে ভিন্ন ভিন্ন দিনে রয়েছে নববর্ষের পৃথক পৃথক অনুষ্ঠানমালা।

আনুমানিক চার হাজার বছর আগে নববর্ষ উদযাপনের প্রচলন শুরু হয় প্রাচীন ব্যাবিলনে। সেখানে নতুন বছর শুরু হতো নতুন চাঁদ দেখা সাপেক্ষে। সেটা ছিল বসন্তকালের প্রথম চাঁদ। বসন্তকালে নতুন ফসল এবং ফুল ফোটার অনুষঙ্গ তাদের কাছে ছিল মুখ্য। এগারো দিন ধরে চলত নববর্ষের উৎসব। রোমানরা তাদের বর্ষ গণনা শুরু করতো মার্চ মাসের শেষ থেকে। তবে বিভিন্ন রোমান সম্রাটদের শাসনামলে তা পরিবর্তিত হতো। রোমান সিনেটররা খ্রিস্টপূর্ব ১৫৩ সালে ঘোষণা করেন জানুয়ারির এক তারিখই হবে বছরের পয়লা দিন। কিন্তু তারপরও খ্রিস্টপূর্ব '৪৬ সাল পর্যন্ত বর্ষপঞ্জি পরিবর্তিত হতে থাকে। তারপর সম্রাট জুলিয়াস সিজার এক তারিখকেই বছরের পহেলা দিন

পুণঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এ কারণে একে 'জুলিয়ান ক্যালেন্ডার'ও বলা হয়। পরে ১৫৮২ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরী জুলিয়ান ক্যালেন্ডার সংশোধন করেন এবং নতুন একটি বর্ষপঞ্জি ঘোষণা করেন। একেই বলে গ্রেগরীয়ান ক্যালেন্ডার বা গ্রেগরীয়ান বর্ষপঞ্জি। এই সৌর ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বর্তমানে ইংরেজি মাস বা বছর গণনা করা হয়। ফ্রান্সে ১লা জানুয়ারিকে নতুন বছরের প্রথম দিন হিসেবে গণনা শুরু হয় ১৫৬৪ সালে। এর আগে সেখানে নববর্ষ হতো ১লা এপ্রিল। মক্কা থেকে ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর হজরত মুহম্মদ (স.) মদীনায় হিজরত করেন। পরে খলিফা হজরত উমরের (রা) এই ঘটনাকে শুরু হিসাব করে হিজরী সাল প্রবর্তন করেন। এই সাল অনুসারে মহররম মাসের ১ তারিখ হিজরী নববর্ষ গণনা করা হয়।

বিভিন্ন দেশ তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়ে বৈশাখ পালন করলেও উৎসবের ধরনে রয়েছে ভিন্নতা। বৈশাখের নামও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের। কয়েকটি অঞ্চলে বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন অর্থাৎ ১৪ এপ্রিলেই দিবসটি পালন করা হয়।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নববর্ষ উৎসব অনেকটা বাংলাদেশের মতো মধ্য এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দুটি ভারতীয় রাজ্য মণিপুর ও আসামে দিবসটি ১৪ এপ্রিল পালন করা হয়। আসামে এই উৎসবের নাম 'রঙ্গালি বিহু'। রঙের খেলা এবং নাচগানের এই নববর্ষের উৎসব পালিত হয় ১৪ এপ্রিল।

নেপালেও নববর্ষ উদযাপন করা হয় বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন। সেদেশে নববর্ষের সবচেয়ে জমকালো উৎসব হয় ভক্তপুরে। এটি বিষকেত যাত্রা উৎসব নামে পরিচিত। নববর্ষে চার দিন আগে শুরু হওয়া এ উৎসব চলে নয় দিন ধরে। নেপালে নববর্ষ উদযাপিত হয় মৈথিলী নববর্ষের মতোই ১লা বৈশাখে। পাঞ্জাবেও নানক শাহী শিখেরা ১৪ এপ্রিলে 'বৈসাবী' নামে ফসলের উৎসব হিসেবে নববর্ষ উদযাপন করেন।

থাইল্যান্ডে নববর্ষের নাম 'সংক্রান'। এই উৎসব এপ্রিলের ১৩ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত বৌদ্ধ নববর্ষ উৎসব হিসেবে উদযাপিত হয়। তারা রাস্তায় পানির পিচকারি বা বালতিতে পানি নিয়ে সেই পানি দিয়ে মানুষকে ভিজিয়ে উৎসবটি পালন করে।

তামিলরা পালন করে 'চিত্রাই'। তবে এর পুরোটাই মন্দিরভিত্তিক উৎসব। পাঞ্জাবী শিখরাও 'বৈশাখী' পালন করে, প্রধানত অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে।

গ্লেনউডে সিডনির সর্ববৃহৎ শিখ মন্দির। এখানে প্রতিবছর বৈশাখের প্রারম্ভে মহা ধুমধামে এরা ভৈসাবী (বৈশাখী) উদযাপন করেন।

শ্রীলঙ্কায় বৈশাখী উৎসব হয় 'আলুথ আউরুদু' নামে। তেমনি কম্বোডিয়ায় 'চাউল চা থামে' নামে এ উৎসব হয়ে থাকে। চীনের ইউনান প্রদেশে 'দাই' সম্প্রদায় বুদ্ধের উদ্দ্যেশে পহেলা বৈশাখ পালন করে থাকে।

বাঙালি জনগোষ্ঠীর বাইরে পহেলা বৈশাখে এদেশীয় অন্য যে সব জাতিগোষ্ঠী তাদের নববর্ষ উদযাপন করে তাদের মধ্যে আছে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ১১টি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী এবং সিলেটের মণিপুরি জনগোষ্ঠী। এরমধ্যে ত্রিপুরাদের বৈসু, মারমাদের সাংগ্রাই ও চাকমাদের বিজু উৎসব বহুল পরিচিত। বর্তমানে তিনটি জাতিগোষ্ঠী এক সঙ্গে এ উৎসবটি পালন করে বৈসাবি নামে।

মারমা আর রাখাইন আদিবাসী গোষ্ঠীর কাছে নববর্ষের উৎসব 'সাংগ্রাই' নামে পরিচিত। চাকমারা যেখানে পুরনো বছরের আপদ-বিপদ দূরীভূত করার মানসে নদীতে গোসল করে, বয়সীদের গোসল করায়, সেখানে সাংস্কৃতিক বিবর্তনে বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণের উৎসব 'সাংগ্রাই' মারমাদের কাছে হয়ে গেছে পানি ছিটানোর 'জলকেলি' উৎসব। এ উৎসবে নারী-পুরুষ সবাই অংশগ্রহণ করে পরস্পরের ওপর পানি ছিটানোর খেলা করে অনেকটাই থাইল্যান্ডের বৈশাখী উৎসবের আদলে।

বলা যায় এখন সারা বিশ্বজুড়ে বৈশাখী উৎসব বা বৈশাখী মেলার আয়োজন হয়ে থাকে। কথাটা বরং এভাবে বলা যায় যে বিশ্বের যেখানেই বাঙালি আছে সেখানেই বৈশাখী মেলা। অস্ট্রেলিয়ায় সব রাজ্যেই নববর্ষ উদযাপিত হচ্ছে। তবে সিডনিরটাই সবচে' পুরাতন যার শুরুটা হয়েছিলো ১৯৯৩ সালে বারউড গার্লস হাইস্কুলে। পরবর্তীতে সেটা দুভাগে উদযাপিত হচ্ছে টেম্পি এবং অলিম্পিক পার্কে। মোদ্দা কথা - যেখানেই বাঙালি থাকবে সেখানেই বৈশাখী মেলা। বৈশাখী বর্ষবরণ বাঙালির ঐতিহ্য, বাঙালির সংস্কৃতি, বাঙালির প্রাণের মেলা।